দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 25 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

মঞ্জুরি কমিশনে নতুন চেয়ারম্যান

অনেক দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এসেছেন যিনি কোন রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদ নিয়ে এই উচ্চাসনে বসেননি। ড. নজরুল ইসলাম একজন নগর ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত। নগর পরিকল্পনা ও পরিবেশ বিপন্নতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য ও মতামত খুব গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। ইউজিসির চেয়ারম্যান হিসেবে যাঁরা তাঁকে মনোনীত করেছেন, বিশেষ কোন্ বিবেচনায় করেছেন, জানতে ইচ্ছে হয়। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে অভিজ্ঞ হিসেবে যাঁরা উপাচার্য বা সমপর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে তাঁরাই বিবেচিত হতেন। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর আবু মহ্‌মেদ হাবিবুল্লাহ, ইউজিসির প্রথম ও দ্বিতীয় চেয়ারম্যান উপাচার্যের দায়িত্ব পালন না করলেও অধ্যাপনায়-গবেষণায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ঘাটতি পূরণ হয়েছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্মিলিত সম্পদে। মঞ্জুরি কমিশনের প্রথম পর্যায়ে এঁদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে আস্থাভাজন করেছিল। একই সময়ে সরকারের আস্থার মর্যাদা রক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় মহলের আস্থা অর্জন করা,—কাজটা সহজ নয়।

ড. নজরুল ইসলামকে ইউজিসির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করায় আমি তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁকে আমি বহুদিন যাবত একজন স্বচ্ছ ও সুস্থ চিন্তার মানুষ,—এই পরিচয়ে জানি। দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন সুনামের সঙ্গে এবং অধ্যাপক পদের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। প্রশাসনিক পদের উচ্চতলায় ওঠার ইঁদুর দৌড়ে শরিক হননি। তাঁর নিজের বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রেই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। একই ধরনের নিবেদিতচিত্ততা নিয়ে নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন, এমন শিক্ষক প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই আছেন বেশ কয়েকজন,—এ আমার বিশ্বাস। তাঁরা আছেন বলেই ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়েও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও একেবারে তলিয়ে যায়নি। এই ব্যতিক্রমী চরিত্রের শিক্ষকেরা সচরাচর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য পদের জন্য প্রার্থী হন না। যেহেতু ওখানে গেলে এমন অনেক অন্যায় ও দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করতে হয়—যা তাঁদের রুচি বিরুদ্ধ। তাছাড়া নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এক ধরনের সর্বমহলের সমর্থন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রধান হওয়ার মধ্যে একটা অলিখিত শর্ত থাকে; যাদের সমর্থন নিয়ে বিজয়ী হয়ে উপাচার্য হয়েছেন, তাঁদের স্বার্থ দেখতে হবে। তাঁদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ। এই স্বার্থ দেখতে গিয়ে অনেক ভাল লোকও মাঝে-মধ্যে খারাপ কাজ করেন, বা করতে বাধ্য হন। এর মধ্যে সবচেয়ে নিন্দনীয়, সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো শিক্ষক নিয়োগে ও পদোন্নতিদানে পক্ষপাত। হাল আমলে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রভাবশালী কোন ছাত্র সংগঠনের অন্যায় আবদার শোনা, আবাসিক হলের পরিচালনায় প্রভোস্টের কাজে হস্তক্ষেপ করা, এমনকি হল প্রশাসনকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সেই ভূমিকায় ছাত্রদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দের চলে আসা। পুরো প্রশাসন দলীয়করণের ফলে সমমনস্ক হলে অবশ্য এ ধরনের প্রত্যেকটি অনাচার অত্যন্ত মসৃণভাবে সংঘটিত হতে পারে। অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ/ প্রতিরোধ সমস্যার সৃষ্টি করলে প্রশাসন, তার ছাত্রশক্তির সহায়তায় প্রতিবাদী ছাত্রদের আবাসিক হল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন কায়েম করা ইউজিসির প্রাথমিক দায়িত্ব নয়। এ-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। ইউজিসির দায়িত্ব, সরকার থেকে পাওয়া বরাদ্দ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝিয়ে দেয়া, সে-অর্থের সদ্ব্যবহার হয়েছে কিনা, সেটা নিশ্চিত করা। উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা দান, অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি বা নতুন বিভাগ প্রণয়ন। একদিকে সরকার অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, দুই-এর মধ্যে মধ্যস্থতা করা, যাতে সরকারকে বা বিশ্ববিদ্যালয়কে, অপরপক্ষের সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়া না করতে হয়। একদিকে সরকারের চক্ষু-কর্ণের কাজ করা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত চাহিদা, প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করা, ও সে-চাহিদা, সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারার মধ্যেই ইউজিসির সার্থকতা।

> অবশেষে ইউজিসি নিজের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের প্রকৃত ঠিকানা, বা নিজের প্রকৃত লক্ষ্য খুঁজে পায়নি। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ও পরিকল্পনায় যে-নেতৃত্ব দেয়ার কথা ইউজিসির তাও দিতে পারেনি ইউজিসি। কেন দিতে পারেনি, সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। ইউজিসিকে নিজের সাংগঠনিক দুর্বলতা উপলব্ধি করতে হবে, ও কাটিয়ে উঠতে হবে। ইউজিসিকে হতে হবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও অধ্যাপকমণ্ডলীর মিলনকেন্দ্র

ইউজিসি এ কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে করতে পেরেছে কিনা, সে বিষয়ে মতপ্রকাশের শেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জাতীয় সংসদের ওপর। কারণ ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করতে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে, সংসদে উপস্থাপনের জন্য। প্রথম থেকেই এ নিয়ম চালু আছে, কারণ রাষ্ট্রপতির যে, আদেশবলে (১৯৭৩) ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত, সে আদেশেই এ-বিধান দেয়া আছে। আমার সামনে এ-মুহূর্তে আদেশটি নেই। তবু আশা করি আমি যা বলছি, সঠিক বলছি। ইউজিসির বার্ষিক সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে। বেশ কিছু পরিসংখ্যানভিত্তিক সারণি সন্নিবিষ্ট থাকে ওই প্রতিবেদনে। এ থেকে ধারণা হতে পারে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা নিবিড় চিত্র আমরা পেলাম। পরিসংখ্যান অনেক কথা বললেও সব কথা বলে না। সারণিগুলোতে যা পাওয়া যাবে না তা অংশত পাওয়া যায় প্রতিবেদনের উপসংহারে যেখানে কমিশন সামগ্রিক পরিস্থিতির একটা চুম্বক হাজির করে। এর উদ্দেশ্য হলো, সরকারের এবং বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কয়েকটি সমস্যার প্রতি এবং কিছু সমাধানের ইঙ্গিত দেয়া। বিগত দু'তিন বছরের বার্ষিক রিপোর্ট আমি দেখিনি, তবে পূর্বেকার প্রায় সব রিপোর্ট দেখা আছে বলে আমি রিপোর্টের অন্তর্বস্তু বিষয়ে কথাগুলো বলতে পারছি।

গুরুত্বপূর্ণ এই বার্ষিক রিপোর্টটি সংসদে পেশ হওয়ার পর কী হয়? এখানে আমার স্মৃতি আমাকে সহায়তা করছে না। কিছুদিন থেকে সংসদের গঠন এমনভাবে হয়েছে যে, সদস্যদের মধ্য থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে এমন সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে। সংসদ যেহেতু কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত হয়েছে। এবং এই কোটিপতিরা যেহেতু নিজেদের সন্তানদের আর দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না, পাঠাচ্ছেন হয় বিদেশে, বা দেশে তাদেরই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন এমন কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে গড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেহেতু ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন, এটা আশা করা যায় না। একটা নিয়ম রক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, রিপোর্ট পৌঁছে যাচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে, যিনি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ও অদ্বিতীয় চ্যান্সেলর (কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি নন)। রিপোর্ট পেশ করা হচ্ছে জাতীয় সংসদে, কিন্তু সংসদ সদস্যদের সময় নেই, আগ্রহ নেই, এমনকি যোগ্যতাও নেই, রিপোর্টের ওপর গভীর ও ভন্নিষ্ঠ আলোচনার জন্য একটি সেশন দাবি করা।

আশা করি আমার এই মন্তব্য সংসদ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবে না। যা বলেছি, সংসদের প্রতি পুরো শ্রদ্ধা রেখেই বলেছি। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সংসদীয় কার্যক্রমের কোন মুদ্রিত বিবরণ দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ব্রিটিশ আমলে বঙ্গীয় আইন সভার কার্যক্রম নিয়মিত মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হতো— আমার বালক বয়সে একটি রিপোর্ট দেখার ও পড়ার সুযোগ হয়েছিল—, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রে আমাদের জাতীয় সংসদের কর্তাব্যক্তিরা সংসদীয় কার্যক্রম মুদ্রণের ও প্রকাশের কোন দায়দায়িত্ব স্বীকার করেন বলে মনে হয় না।

ইউজিসির বার্ষিক রিপোর্টে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও, দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। সেই সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে, বলার চেয়ে না-বলা কথাই বেশি। যে অসম্ভব দ্রুততায় বিএনপি ও জোট সরকারের আমলে ঢাকার কয়েকটি মহল্লায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে, সেটা আর যার স্থিতির কারণ হোক বা না-হোক, মহল্লাবাসীদের জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে; পথচারীদের জন্য, মোটরযানচারীদের জন্য অনেক দুর্ভোগের কারণ হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। ইউজিসির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. নজরুল ইসলাম ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন, ঢাকা শহরে নতুন কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে না। যেগুলো পূর্বেই অনুমতিপ্রাপ্ত ও নগরবাসীদের অশেষ যন্ত্রণার উৎস সেগুলো নিরাপদ দূরত্বে অপসারণের কোনও পরিকল্পনার কথা তিনি বোধহয় বলেননি। আশা করি সমস্যাটির প্রতি তাঁর নজর পড়বে, এবং একজন নগর বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবাদী হিসেবে তিনি এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অনেক বছর নানা অনিশ্চিত ঠিকানায় ঘোরাফেরা করে অবশেষে ইউজিসি নিজের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের প্রকৃত ঠিকানা, বা নিজের প্রকৃত লক্ষ্য খুঁজে পায়নি। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ও পরিকল্পনায় যে-নেতৃত্ব দেয়ার কথা ইউজিসির তাও দিতে পারেনি ইউজিসি। কেন দিতে পারেনি, সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। ইউজিসিকে নিজের সাংগঠনিক দুর্বলতা উপলব্ধি করতে হবে, ও কাটিয়ে উঠতে হবে। ইউজিসিকে হতে হবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও অধ্যাপকমণ্ডলীর মিলনকেন্দ্র। এর গ্রন্থাগারের দৈন্যদশা দেখে আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি। এর জনবল অপ্রতুল ও মানসম্মত নয়। এর পরিদর্শন (ইনসপেকশন) কার্যক্রম প্রায় শূন্যের কোঠায়। এখানে কি পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেবেন নতুন চেয়ারম্যান, দেখার আশায় আছি আমরা।